প্রথম অধ্যায়

উনিশ শতকের সমাজ জীবন, বিধবার সমস্যা ও বিধবা আন্দোলন প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষে উনিশ শতক হল নবজাগরণের যুগ। ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে ও তাদের সাহিত্য-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে নির্মিত হয় ভারতবাসীর নতুন চিন্তা চেতনার জগৎ। নতুন যুগে দাঁড়িয়ে রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬- ১৮৯৯),অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৬৬), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৩১- ১৯০৮) , কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮- ১৮৮৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮- ১৮৯৪), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০-১৮৭০) প্রমুখ মনীষীর প্রচেষ্টায় শুরু হয় ধর্ম, সাহিত্য ও সমাজ বদলের পটচিত্র। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয়সভা', ডিরোজিও'র ছাত্রবৃন্দের (ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর) প্রগতিশীলতা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভা, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি গোষ্ঠীর শ্রেণীবদ্ধ ক্রিয়াকলাপ বঙ্গসমাজের সর্বস্তরে আলোড়ন তোলে।

আধুনিকতার প্রধান শর্তই হল—পুরোনো অমানবিক বিষয়কে প্রত্যাখ্যান। এবং ক্রমে ধীরে ধীরে তর্ক-বিতর্ক আলোচনার মধ্য দিয়ে নতুনকে বরণ করে নেওয়া। সংঘাত বাঁধে পুরোনোপন্থী ও নতুনপন্থীদের সংঘাত, তর্ক-বিতর্ক। সমাজস্তরে চলতে থাকে পালাবদলের মহড়া। ক্রমে আধুনিকতার জয় হয়, পুরোনো চিন্তা ভাবনা পরিত্যক্ত হয়। এভাবেই সমাজের নিরন্তর ভাঙা-গড়া চলে। উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন গুলির ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছিল। একদল রক্ষণশীল মানুষ যেমন আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তেমনি একদল প্রগতিশীল মানুষ নতুন যুগকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের প্রথম পর্বে সবচেয়ে বড় সমাজ আন্দোলন 'সতীদাহ প্রথা নিবারণ'। এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় কলকাতায়

আসেন। রামমোহন কলকাতায় আসার পর বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে সূচিত হয় পালাবদল। বহুদিন ধরে চলে আসা হিন্দুদের 'সতীদাহ প্রথা' তথা 'সহমরণ প্রথা'র ভিত্তিমূলে তিনি আঘাত হানেন। রামমোহন রায় অনুভব করেন, হিন্দুর সতীদাহ প্রথা আসলে—'জ্ঞানপূর্বক স্ত্রী হত্যা।' রামমোহন প্রায় একক ভাবে 'সতীদাহ প্রথা' বন্ধের জন্য শুরু করেন লেখালিখি ও আইনী তৎপরতা। মানুষ পুড়িয়ে মারার ঘৃণ্য প্রথাকে ইংরেজ শাসকেরা কোনোকালেই ভালো চোখে দেখেননি। ধর্মীয় ব্যাপার বলেই ও সামাজিক অসন্তোষের কথা ভেবে ইংরেজ সরকার এই ঘৃণ্যপ্রথা সম্পর্কে তীব্র বিরাগ থাকলেও নীরব ছিল। কিন্তু রামমোহনের আইনী আবেদনে সাড়া দিয়ে ইংরেজ সরকার 'সহমরণ প্রথার' কুফল বিবেচনা করে ১৮২৯ সালে আইন করে 'সতীদাহ প্রথা' বন্ধ করে দেন। শুধু হয় আধুনিকতার নতুন যুগ।

উনিশ শতকে বাংলা সমাজে চলে আসা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দেখা দেয় অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণা। হিন্দু সমাজে একটি প্রবাদ চালু আছে,—'পতিই নারীর গতি।' ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পতির মৃত্যুর পর নারী 'বিধবা' বলে পরিচিত হয়। 'বিধবা' নারীর ব্রহ্মচর্য জীবন যাপনই হল শাস্ত্রীয় বিধান। স্বামীর মৃত্যুর পর রাতারাতি একটি সধবা নারী বিধবাতে পরিণত হয়। রঙিন কাপড় পরা, সিঁদুর পরা, গন্ধদ্রব্য ব্যবহার, পান খাওয়া, চুলের যত্ন নেওয়া, অলঙ্কার পরা, কোমল বিছানায় শোওয়া, দুবেলা অন্ন নেওয়া, এমনকি, প্রিয়জনের শুভ উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া—এসবই তার জীবন থেকে অপসৃত হয়। নব্য বিধবার জীবনই শুরু হয় নিরামিষ একাহার, গঙ্গাজল পান, আভরণহীন সাদা থান, ও উপোষকে সঙ্গী করে। পুজো-অর্চনা, ব্রতকথা, ভাগবত পাঠ শ্রবণ আর কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে জীবনকে অতিবাহিত করতে হয়। বিসর্জন দিতে হয় মনের সব কামনা বাসনা। বস্তুত হিন্দুসমাজ বিধবার কামনা-বাসনা যৌনাকাঙ্ক্ষাকে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের দোহাই দিয়ে অবদমনের মধ্য দিয়ে অস্বীকার করতে চেয়েছে।

রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে বিধবা নারীর সহমরণ যাত্রা তথা 'সতীদাহপ্রথা' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কার্যকারণ সূত্রে অবশম্ভাবী হয়ে পড়ে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গটি। 'সতীপ্রথা' রদ হবার কয়েক বছরের মধ্যেই সমাজে দ্রুত সংখ্যায় বেড়ে যায় বাল বিধবার সংখ্যা। কুলীন ব্রাহ্মণের একাধিক বিধবা স্ত্রীর 'সহমরণ' না হওয়ার কারণে সমাজে নতুন বিপত্তি দেখা দিল। অল্পবয়স্কা কিংবা নাবালিকা বিধবার উত্তরাধিকার নিয়ে দেখা দেয় নানা সংকট। অসহায় বিধবাদের না ঠাঁই হয় শ্বশুর বাড়িতে, না ঠাঁই হয় বাপের বাড়িতে। ফলত তাঁদের ব্যক্তিজীবন

হয়ে ওঠে নিরুপায় ও আশ্রয়হীন। এই বিধবাদের একটা বড় অংশ সমাজ কলঙ্কে জড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ জীবন বাঁচানোর তাগিদে কলকাতার নব্যবাবুদের বাগানবাড়িতে রক্ষিতা হয়ে যায়। কেউ কেউ আশ্রয়হীন হয়ে, হুগলী তীরে গড়ে ওঠা নতুন নগর কলকাতার কালীঘাট সংলগ্ন পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। সমাজে ঘটতে থাকে অবৈধ গর্ভপাতের ঘটনা। নবীন বিধবাদের পরিচয় হয় 'রাঁড়'। এভাবেই ১৮২৯ পরবর্তী কলকাতার তিন দশক সমাজে নানান গোলযোগ ও সংকট তৈরি হয়। ফলে প্রগতিশীল সমাজ হিতৈষিরা ভাবতে শুরু করেন এই সংকট হতে পরিত্রাণের উপায় কী।

বিদ্যাসাগরের বিধবা আন্দোলনের পূর্বে বিধবাবিবাহের একটা প্রাক্ ইতিহাস আছে। বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়টি শুধুমাত্র বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন তা নয়। বিদ্যাসাগরের বহুপূর্বে এদেশের বিদ্বৎজন এ নিয়ে সরব হয়েছিলেন। উপযুক্ত যুক্তি প্রমাণ, সমাজ প্রতিবেশ-প্রতিকূলতা বিধবা বিবাহের পক্ষে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। 'বিধবা বিবাহ'- এ আইন পাশ হওয়ার পিছনে ছিল বহুদিনের এবং বহুজনের বিচ্ছিন্ন ও সংঘবদ্ধ সংগ্রাম। বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় 'বিধবা বিবাহ' আইন চালু হবার পূর্বে, বাংলায় বিধবা বিবাহের উদ্‌যোগ বা প্রচেষ্টা দেখা যায়। রাজা রাজবল্লভ (১৬৯৮-১৭৬৩) তাঁর তরুণ বিধবা কন্যার শাস্ত্রীয় মতে বিধবাবিবাহ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এ চেষ্টা সফল হয়নি। কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র উপঢৌকন ও পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে নবদ্বীপের কিছু পণ্ডিতের কাছ থেকে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় বিধান চেয়েছিলেন এবং বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন । সেখানেও কোন সুরাহা হয়নি। সমকালীন সমাজ মানসিকতা ও লোকভয় সম্পর্কে কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন,—"*মনু, স্মৃতি, ভগবদগীতা, উপনিষদ্, ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠে [রাজা শ্রীশচন্দ্র] প্রবৃত্ত হন, তদনন্তর, নবদ্বীপ ও ভাটপাড়া প্রভৃতি নানা স্থানের বৈদান্তিক, নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের সহিত বেদবিহিত বিষয়ের বিচার করেন। বুদ্ধিমান ও বিদ্বান পণ্ডিত গণের মধ্যে যাঁহারা সরলচিত্ত, তাঁহারা মহারাজের অভিপ্রায় শাস্ত্র-সম্মত ও সর্ব্ব-জন-হিত বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু দেশাচার ভয়ে, জন সমাজে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে বা তদনুযায়ী ব্যবস্থা দিতে, সাহস করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের প্রধান ভয় এই হইল যে, তাঁহারা এই মত ব্যক্ত করিলে, সাধারণে, তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া, তাঁহাদের নিমন্ত্রণ রহিত করিবেন।*"[১] ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় চালু হওয়া 'বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ণ' এর

প্রায় একশ বছর আগে এ ঘটনা ঘটেছিল।

১৮১৫ সালে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠা করেন 'আত্মীয় সভা'। এই আত্মীয় সভায় ১৮১৯ সালের একটি বৈঠকে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বাল্যবৈধব্যের সমস্যামুক্তির কথা আলোচিত হয়েছিল। হিন্দুর বালবিধবার পক্ষে যে ব্রহ্মচর্য পালন কতটা কষ্টের ও অসহনীয় তা এই আত্মীয় সভার বৈঠকে আলোচিত হয়। ১৮৩৭ সালে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ নিয়ে একটি সভা করবার কথা ভেবেছিলেন সেকালের বিদ্বৎসমাজ। উদ্যোক্তা ছিলেন 'কতিপয় ধনি লোক'।[২] কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুনেতাদের ভয়ে শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি। উদ্যোক্তাদের মধ্যে মতিলাল শীল ও হলধর মল্লিক ছিলেন প্রধান। ১৮৩৭ সালে গঠিত হয় 'ইণ্ডিয়ান ল কমিশন'। গ্র্যান্ট সাহেব ছিলেন এর সেক্রেটারী। এই কমিশন বুঝেছিল, বঙ্গদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকার কারণে সমাজে দারুণ রকম ব্যভিচার বেড়ে গেছে ; ফলে সমাজে শিশু হত্যা ও গর্ভপাতের ঘটনা বেড়ে চলেছে। এই 'ল কমিশনের চেষ্টা'য় বিধবাদের পুনর্বিবাহ ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরা বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করেন। যদিও, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা হবার আশঙ্কায় কমিশন অগ্রসর হননি প্রথম দিকে। সমাজে যখন বিধবা বিবাহ আন্দোলনের তরঙ্গ উঠল তখন তাঁরা বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা শুরু করে দেন।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পূর্বে, সোচ্চারভাবে ও সংগঠিত ভাবে আন্দোলন করেছিল ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী। ১৮২৮-১৮২৯ — এই সময়কালে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সংগঠন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' এর নানা সভায় 'বিধবা বিবাহ' এই সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচিত হয়। 'ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী'র মধ্যে ছিলেন—রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ। ডিরোজিও'র শিষ্যবর্গ চেয়েছিলেন সংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজকে আমূল বদলে দিতে। ফলে তাঁদের কাছে খুব জরুরী বলে মনে হিয়েছিল বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গটি। 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রাক্ বিদ্যসাগর যুগের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর মুখপত্র *'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'* পত্রিকায় ১৮৪২ সালে জনৈক ব্যক্তি একটি পত্রে লেখেন,—*"যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্ব্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্ব্বিবাহ*

করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামীর পরলোক হইলে বিবাহ করণে সক্ষমা না হয়...।"[৩]

উনিশ শতকের তিনের দশকে *'জ্ঞানান্বেষণ'* ও *'সমাচার দর্পণ'* পত্রিকায় বিধবা বিবাহ নিয়ে আলাপ আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। পরবর্তী দশকে ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত *'সংবাদ প্রভাকর'*,*'বেঙ্গল স্পেকক্টেটর'* প্রভৃতি পত্রিকায় বিধবা বিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা চরমে পৌঁছয়। ১৮৪৫ সালে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি' বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। বিভিন্ন সংগঠনের তরফে সরকারের কাছে বিধবা বিবাহের জন্য আবেদন জানানো হয়। ১৯৪৫ সালে বিধবাবিবাহের ঘোরতর বিরোধিতা করে গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মা নামে এক ব্যক্তি 'বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়কব্যবস্থা' নামে তিরিশ পৃষ্ঠার এক পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পূর্বে বঙ্গদেশে বোধহয় প্রথম এই গ্রন্থটিই বোধ হয় বিধবা বিবাহের বিরোধিতা মূলক প্রথম গ্রন্থ। *'বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়কব্যবস্থা'* গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা হয়, —*''বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হইবার শাস্ত্র প্রচার করিয়া কোনো পণ্ডিতাভিমানী এক ব্যবস্থা পত্র প্রস্তুত করত বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাটী নামক সমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন অভিপ্রায় তদ্দ্বারা তাহা গবর্ণমেন্টে প্রদত্ত হয় কিন্তু ঐ সমাজের সম্পাদক শ্রীযুত উলিয়ম থিওবৌল্‌ড সাহেব ঐ ব্যবস্থার যাথার্থ্যাযাথার্থ্য নিশ্চয় করণার্থ স্বীয়াভিপ্রায়ক লিপি সম্বলিত ঐ ব্যবস্থা পত্র ধর্ম্মসভায় প্রেরণ করেন অনন্তর ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ পন্ডিতগণ কর্ত্তৃক তদুত্তর ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত হইয়া উক্ত সম্পাদকের নিকট পাঠান গিয়াছে তাহার মর্ম্মার্থ সর্ব্বসাধারণ গোচরার্থ তদবিকল সংস্কৃত এবং তদীয় ভাবার্থ সমাজের অনুজ্ঞানুসারে প্রকাশ করা গেল যদ্যপিও বিশিষ্ট শিষ্ট ধর্ম্মিষ্ঠগণের বিলক্ষণ বিজ্ঞান আছে যে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হইবার শাস্ত্র নাই তথাপি অজ্ঞ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ ব্যবস্থাভাসে মনশ্চঞ্চল্য না জন্মে তজ্জন্য এই প্রাড়ম্বর সুতরাং করিতে হইল ইতি—।''*[৪]

বস্তুত এ গ্রন্থের ভূমিকায় উঠে এসেছে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান' এর ও 'ধর্মসভা'র বিধবা বিবাহ আলোচনা প্রসঙ্গ। তদুপরি ইংরেজ সরকারের সহায়তায় বিধবা বিবাহ আইনে পরিণত হওয়ার আশঙ্কাও জেগেছে প্রাবন্ধিকের মনে। এভাবেই চলেছে বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষের সওয়াল-জবাব পর্ব।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের দশ বছর আগে কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলের বাসিন্দা নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকজন অবস্থাপন্ন লোককে সঙ্গে নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে একটি বিধবা বিবাহ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সমাজ অনুশাসনের কাছে তাদেরও হার মানতে হয়। এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' গ্রন্থে

লিখেছেন—''*অগ্রজের উক্ত প্রস্তাবের দশ বৎসর পূর্ব্বে বহুবাজার নিবাসী বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় ভবনে কতকগুলি আত্মীয় লোককে ঐক্য করিয়া বিধবাবিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এরূপ অপরাপর দেশে অনেকেই বালবিধবা দেখিয়া দুঃখানুভব করিয়া বিধবা বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন। কিন্তু সমাজের ভয়ে অগ্রে প্রবৃত্ত হইতে কাহারও সাহস হয় নাই।...অগ্রজ মহাশয়ের বিধবা বিবাহের পুস্তক মুদ্রিত হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার অন্তঃপাতি পটলডাঙ্গানিবাসী বাবু শ্যামাচরণ দাস কর্ম্মকার, স্বীয় দুহিতার বৈধব্য দর্শনে দুঃখিত হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যদি ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন পুনর্ব্বার কন্যার বিবাহ দিব। তদনুসারে তিনি সচেষ্ট হইয়া বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক এক ব্যবস্থা পত্র সংগ্রহ করেন। উহাতে ৺কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্মণ পন্ডিতের স্বাক্ষর আছে। ইহাঁরাই এতদ্দেশের স্মার্ত ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই ঐ ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, কিছু দিন পরে তাঁহারই আবার বিধবাবিবাহের বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠেন।*''[৫] রামমোহন রায় ঠিক যে জায়গায় তাঁর 'সতীদাহ' নিরারণ আন্দোলন শেষ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঠিক সেই জায়গা হতে সমাজ গঠনের নতুন আন্দোলন শুরু করলেন।

পরাধীন ভারতবর্ষের আচার সর্বস্ব সমাজ প্রতিবেশে দাঁড়িয়ে আবেগমাখা সমবেদনা, করুণা,পরদুঃখকাতরতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বিধবার পুনর্বিবাহে'র[৬] প্রসঙ্গটিকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখলেন, বিচার বিশ্লেষণ করলেন এবং বিধবা সমস্যা সংকট মোচনে কলম ধরলেন। ভারতীয় হিন্দু সমাজে নিম্নবর্ণের লোকেদের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ চালু ছিল। বিদ্যাসাগর উচ্চবর্ণের বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহের জন্য সচেষ্ট হলেন। 'বিধবা বিবাহে'র পক্ষে সওয়াল করে বিদ্যাসাগর ১৭৭৬ (১৮৫৪) শকাব্দের ফাল্গুন মাসে *'তত্ত্ববোধিনী'* পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' এই শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর এক বছর পর ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে *'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'* এই শিরোনামে তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সমালোচক বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন,—'*এই বছর অক্টোবর মাসে তিনি বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠান।*'[৭] *'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'* (১ম খণ্ড) এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর 'পরাশর সংহিতা' থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখালেন

'বিধবা বিবাহে'র শাস্ত্রসম্মত যৌক্তিকতা। *'পরাশর সংহিতা'*র শ্লোক তুলে বিদ্যাসাগর লিখলেন,

— *''নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।*

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্য বিধীয়তে।''[৮]

অর্থাৎ হল,—স্বামী যদি দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ হন, মারা যান, প্রব্রজ্য অবলম্বন করেন, ক্লীব, অথর্ব বা পতিত হয়,—তাহলে এই পাঁচপ্রকার আপদকালীন পরিস্থিতিতে নারী পুনর্বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন, সেখানে কোনো শাস্ত্রীয় বাধা নেই।

বিদ্যাসাগরের *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্‌বিষয় প্রস্তাব'* গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ও আন্দোলনের উদ্দীপনা সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন,—*''১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উঠে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "বিধবাবিবাহ উচিত কিনা'' একটী ক্ষুদ্র চটী* [পুস্তিকা]*প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দুসমাজরূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ স্থির ছিল; এ চটী* [পুস্তিকা]*বাহির হওয়াতে মহাবাত্যান্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গ উঠাইতে থাকে। যাঁহারা এই আন্দোলন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়াতে আন্দোলন আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল। বিশেষতঃ ঐ পুস্তকের বাগদান অধ্যায় লইয়া বিশেষ আন্দোলন হয়। যেরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পুস্তকে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন তাহা অতীব সন্তোষজনক।''*[৯] হিন্দু নারীর পুনর্বিবাহ নিয়ে সমাজ তোলপাড় হয়ে উঠল বিদ্যাসাগরের এই বক্তব্যে। বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হবার পর একাধিক পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রবল বিরুদ্ধে ছিলেন[১০],—ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, গঙ্গাধর কবিরাজ, মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, জানকীজীবন ন্যায়রত্ন, শ্রীরাম তর্কালকার, ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন, রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দকুমার কবিরত্ন, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, হারাধন কবিরাজ, রামদয়াল তর্করত্ন ও রামধন বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ। এদের আক্রমণে শাস্ত্রীয় যুক্তি অপেক্ষা কটূক্তি ব্যঙ্গ ও উপহাস ধ্বনিত হয়েছে।

বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করে ওঠে নানা বিপরীতমুখী প্রশ্ন। বিধবা বিবাহের যাঁরা বিপক্ষে ছিলেন তাঁদের প্রধান বক্তব্যগুলি এই রকম[১১],—

ক) আমাদের সমাজব্যবস্থায় বিধবাবিবাহ আইন খাপ খায় না। যা ইংরেজদের

সমাজব্যবস্থায় সঙ্গতপূর্ণ তা আমাদের সমাজব্যবস্থায় নয়।

খ) বিধবা বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, আচার বিরুদ্ধ। যজুবেদ, মনু, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে কোথাও বিধবা বিবাহের সমর্থন নেই।

গ) বিধবা বিবাহ আইন হলে হিন্দু পরিবারের উত্তরাধিকার হবার যে শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রচলিত আছে তাতে গোলযোগ তৈরি হবে। তাছাড়া বিধবার বিবাহ হলে তার গর্ভজাত পুত্র এদেশের শাস্ত্র অনুযায়ী জারজ বা বেশ্যাপুত্র রূপে গণ্য হবে।

ঘ) বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইন করে বিধবার গর্ভজাত পুত্রকে উত্তরাধিকার হিসাবে গণ্য করলে এদেশে অনেকের বংশলোপের সম্ভাবনা আছে। কারণ এদেশে অপুত্রক ব্যক্তি দত্তক নিয়ে বংশ রক্ষা করে থাকে। ফলে বংশলোপের সম্ভাবনা প্রবল আকারে দেখা দেবে।

ঙ) বিধবা বিবাহের আইন হলে, অনেক স্ত্রীর স্বধর্মে মতি স্বত্ত্বেও অর্থলোভী ষড়যন্ত্র করতে পারে।

চ) বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন সমাজ হিত নয় বরং সমাজ অহিতের আইন। আইন পাশ করে জনসমাজের ধ্যান-ধারণা, আচার ব্যবহার ও মতামত পরিবর্তন করা যায় না, বরং জোর করে তা করতে গেলে তার ফল বিপরীত হয়। বস্তুত, বিরুদ্ধবাদীরা বোঝাতে চাইলেন, বিধবা পুনর্বিবাহ মানে, ইহ জীবনে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া, এবং পরজীবনে (মরজীবনে) স্বর্গবাস থেকে বঞ্চিত হওয়া। বিধবার পুনর্বিবাহ হলে যে শুধু শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করা হবে তাই নয়, যে পরিবারের বিধবারা তা করবে তারা সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হতে হবে।

১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যসাগরের *'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব'* ।প্রথম গ্রন্থে ছিল শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় গ্রন্থে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অপেক্ষা মানবিক ভাবে জনসাধারণের কাছে আবেদন করলেন, বিধবা বিবাহে এগিয়ে আসার জন্য। দ্বিতীয় গ্রন্থে, সমাজে বিধবা বিবাহ নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে তার সদুত্তর দেবার চেষ্টা করলেন। দেশের সাধারণ মানুষ শাস্ত্রজ্ঞ নন, তাই তাদের পক্ষে শাস্ত্রীয় তত্ত্বকথা অনুধাবন করা সহজ নয়। তাই তিনি শাস্ত্রীয় তত্ত্বের সহজ ব্যাখ্যা করলেন এবং মানবিক আবেদন করলেন। বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশের পর বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধাচরণ, করে লেখালিখির স্রোত কিছুটা কম হয়ে যায়। *'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব'* গ্রন্থের শেষ অংশে বিদ্যাসাগর দেশবাসীর কাছে মানবিক ভাবে আবেদন করে লিখলেন,—*''হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়ন*

করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে।...; তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এক কালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়, যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ-সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্ম গ্রহণ কর, বলিতে পারি না!'[১২]

১৮৬৪ সালে বিদ্যাসাগরের দুটি প্রবন্ধ *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব*, ১ম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড ইংরেজিতে অনূদিত হয় প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে '*Marriage of Hindu widows*' নামে। এ গ্রন্থ প্রকাশে আনন্দমোহন বসু সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সাহেবরাও এর মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। বিদ্যাসাগরের এই মানবিক আবেদনে সাধারণ বাঙালি সমাজ সাড়া দিলেন। শাস্ত্রচিন্তা ও মানবচিন্তার আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর অনুধাবন করেছিলেন—শুধুমাত্র আইন করে বিধবাবিবাহ চালু করলে তা কার্যকর বা বাস্তবায়িত হওয়া মুশকিল। কারণ তিনি জানতেন ভারতবাসী ধর্মভীরু। সে কারণে ধর্মীয় শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী 'বিধবা বিবাহ' এর সমর্থন অনুসন্ধানে নিবিষ্ট হয়েছিলেন। ধর্ম্মগত সমর্থন ও আইনগত সমর্থন এ দুয়ের সমন্বয়ে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহকে সফল করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর বিধবার পুনর্বিবাহের সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে 'বিধবাবিবাহ' আইন প্রণয়নের সমর্থনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ৯৮৭ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন ইংরেজ সরকারকে। 'বিধবা বিবাহ' আইন প্রণয়নের এই সমর্থন পত্রে সই করেছিলেন— কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র, বর্ধমানের রাজা মহতাবচন্দ, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, হিন্দু থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীচরণ লাহিড়ী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,

উমেশচন্দ্র শর্ম্মা, দ্বারকানাথ বসু, ব্রজনাথ মুখার্জী, দুর্গাচরণ সেন, শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর মিত্র, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি। বর্দ্ধমানের মহারাজা মহতাবচন্দ, কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র সেকালে বিধবা বিবাহের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে বিধবা বিবাহ বিষয়টি সাধারণ মানুষ সমর্থন করেছিলেন। এছাড়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তি বর্গ বিধবা বিবাহের ব্যয়ভার বহন করতে প্রচুর অর্থ প্রদান করেছিলেন।

এছাড়া বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে নৈতিকভাবে সমর্থন করেছিলেন হিন্দুকলেজের ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর অনেকেই। যেমন, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গ যেমন বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছিলেন এর পাশাপাশি তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার চুক্তি বা অঙ্গীকার পত্র আইন করার প্রতি জোরদার আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের ফলে বিবাহ রেজিষ্ট্রী আইনের পথকে সুগম করে। পরবর্তী সময়ে ১৮৭২ সালে এই আন্দোলনের প্রভাবে '*Civil Marriage Act III*' বা 'তিন আইনের বিবাহ' চালু হয়।

অন্যদিকে 'বিধবা বিবাহ আইন' এর বিরোধিতা করে হিন্দু সমাজের প্রধান নেতা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ৩৬, ৭৬৩ জন ব্যক্তির স্বাক্ষর সহ আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়। শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহ আইন নিয়ে তীব্র বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। সমকালীন এই আন্দোলন বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা ও সরকারকে চিঠি-পত্র প্রদান, তৎকালীন বাল বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়টি 'ল কমিশনকে' ভাবতে বাধ্য করে। দীর্ঘ সামাজিক টানাপেড়েনের পর নানা বাধা বিপত্তি কাটিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় 'বিধবা বিবাহ' শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হয় ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই। বিধবা বিবাহের বাদানুবাদ সংকটকালে বিদ্যাসাগরই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দৃঢ় চিত্তে বিশৃঙ্খল সমাজ আন্দোলনকে সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, প্রখর যুক্তিবোধ, অধ্যবসায়, নির্ভীক চিত্ত, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অনমণীয় মনোভাব, পরশ্রীকাতর সমবেদনাময় মন বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সম্পূর্ণতা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। 'বিধবা বিবাহে'র সরকারী আইনে বলা হয়,— *"৪৯ বিধবা-বিবাহ এক্ট্ নং ১৫, সন ১৮৫৬।*

ধারা নং ১—হিন্দু বিধবার বিবাহ বৈধ। বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইলে সে পৈতৃক সম্পত্তির অনধিকারিণী হইবে না।

ধারা নং ২— পুনর্ব্বিবাহ হইলে, পূর্ব্ব পতির সম্পত্তির উপর বিধবার কোন অধিকার

থাকিবে না।

ধারা নং ৩— নাবালক সন্তানযুক্ত বিধবা পুনর্ব্বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, মৃত পতির মাতা,পিতা, দিদিমা বা দাদামহাশয় নাবালকের উপযুক্ত অভিভাবক নিযুক্ত করার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন।

ধারা নং ৪—নিঃসন্তান বিধবা মৃত পতির সম্পত্তিতে স্বত্ববান নহে।

ধারা নং ৫—পুনর্ব্বিবাহের পূর্বে বিধবার নিজের কিছুতে স্বত্ব থাকিলে বিবাহের পরও তাহা থাকিবে।

ধারা নং ৬—কুমারীর বিবাহ সময়ে যে মন্ত্রাদি পড়ান হইয়া থাকে, বিধবার বিবাহেও সেই সব মন্ত্রই পড়াইতে হইবে।

ধারা নং—৭ যাহার পতির সহিত সহবাস হয় নাই, এরূপ নাবালিকা বিধবা অভিবাবকের অনুমতি ভিন্ন পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে না। এই বিধি না মানিলে এক বৎসরের কারাবাস হইতে পারে এবং এই বিবাহ নাকচ হইবে। পতি-পত্নীর সহবাসের পর, সে নাবালিকা থাকিবে না, এবং তাহার নিজ স্বীকৃতি অনুসারে পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে।

ধারা নং —৮ নাবালিকা বিধবা পিতার বিনা অনুমতিতে পিতার অভাবে দাদার, দাদার অভাবে মাতার, মাতার অভাবে অন্য কোন নিকটতম আত্মীয় বা বন্ধুর বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিতে পারিবে না। জানিয়া শুনিয়া ইহার বিরুদ্ধে কাজ করিলে দণ্ড জরিমানা ও জেল হইতে পারে। সাবালিকা বিধবা নিজ ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারে।'' [১৩]

আইনত বিধবা বিবাহ পাশ হবার পর প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিধবা বিবাহ প্রদানের বাস্তব প্রয়োগ। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলেই যে বিধবা বিবাহ সমাজে হতে থাকবে এমনটা রাতারাতি সম্ভব নয়। বিধবা বিবাহের কথা মুখে বলে কোনো কাজ হবে না তা দিয়ে দেখাতে হবে। 'বিধবা বিবাহ আইন' পাস হবার পর ঈশ্বর গুপ্ত *'সংবাদ প্রভাকর'* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ব্যঙ্গ করে লেখেন দীর্ঘ *'বিধবা-বিবাহ আইন'* নামের কবিতা। এ কবিতায় ধরা পড়েছে সমকালীন যুগজীবনের ছবি,—

"হিন্দু বিধবার বিয়া আছে অপ্রচার।
বহুকাল হতে যার নাহি ব্যবহার।।
সে বিষয়ে ক্ষতাক্ষত না করি বিশেষ।
করিলেন একেবারে নিয়ম নির্দ্দেশ।।
...কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে, যে সকল রাঁড়ী।

তহারা সধবা হবে, পরে শাঁকা শাড়ী।।

এ বড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর।

কেমন কেমন করে, মনের ভিতর।।

শাস্ত্র নয় যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে।

দেশাচারে ব্যবহারে বাধো বাধো করে।।

যুক্তি বোলে বিচার, করুন শত শত।

কোনমতে হইবে না, শাস্ত্রের সম্মত।।

বিবাহ করিয়া, তারা পুনর্ভবা হবে।

সতী বলে সম্বোধন, কিসে করি তবে?

বিধবা গর্ভজাত, যে হয় সন্তান।

'বৈধ' বোলে কিসে তার করিবে প্রমাণ?

যে বিষয় সর্ব্বাদি-সম্মত না হয়।

সে বিষয় সিদ্ধ করা, শক্ত অতিশয়।।

...শ্রীমান ধীমান, নীতি নির্ম্মাণকারক।

যাঁরা সবে হতে চান, বিধবাতারক।।

নতভাবে নিবেদন, প্রতি জনে জনে।

আইন-বৃক্ষের ফল, ফলিবে কেমনে।।

...গোলে-মালে হরিবোল, গণ্ডগোল সার।

নাহি হয় ফলোদয় মিছে হাহাকার।।

বাক্যের অভাব নাই, বদনভাণ্ডারে।

যত আসে তত বলে কে দূষিবে কারে।।

সাহস কোথায় বল প্রতিজ্ঞা কোথায়?

কিছুই না হতে পারে মুখের কথায়।।

মিছামিছি অনুষ্ঠানে, মিছে কাল হরা।

মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা।।

সকলেই তুড়ি মারে, বুঝে নাকো কেউ।

সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে সাগরের ঢেউ।।

সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ-ঘটন।।
নচেৎ না দেখি কোন, সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই হই, উপহাস সার।।
কেহ কিছু নাহি করে, আপনার ঘরে।
যাবে যাবে যায় শত্রু,যাক্ পরে পরে।।
তখন এরূপ কবে, হলে ব্যতিক্রম।
ফাটায় পড়েছে কলা, গোবিন্দায় নম।।..."[১৪]

অর্থাৎ, মুখে বিধবা বিবাহের কথা নয়, বিধবা বিবাহের আয়োজন করা, তাকে বাস্তবায়িত করা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

সমাজের সর্বস্তরে বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে পক্ষে-বিপক্ষে চাপান-উতরে মথিত হয়ে উঠল উনিশ শতকের বঙ্গ সমাজ। এই সময়কালকে শিবনাথ শাস্ত্রী বর্ণনা করেছেন এইভাবে, —"*১৮৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে বঙ্গদেশে যে আন্দোলন উঠিল, তাহার অনুরূপ জাতীয় উত্তেজনা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্রানুসারে বিধবা বিবাহের বৈধতা লইয়া যে বিচার চলিতেছিল তাহা পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। রাজবিধি প্রণয়নের চেষ্টা আরম্ভ হইলে, সেই আন্দোলন কিঞ্চিৎ পাকিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বিচারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যখন কার্য্যতঃ বিধবা বিবাহ প্রচলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আপামোর সাধারণ সকল লোকে একেবারে জাগিয়া উঠিল। পথে, ঘাটে, হাটে-বাজারে, মহিলা গোষ্ঠীতেএই কথা চলিল। শান্তিপুরের তাঁতীরা, 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে'—এই গানাঙ্কিত কাপড় বাহির করিল।*"[১৫] প্রথমে শিক্ষিত জন পরে আপামোর জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়ে ওঠে 'বিধবার বে দেওয়া বামুন'। মাঠে, ঘাটে, অফিসে, আদালতে আলাপ-আলোচনায় বৈঠকে-বাজারে, হেঁসেলে-রাস্তাঘাটে সর্বত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে বিধবার পুণর্বিবাহ প্রসঙ্গটি। সমাজে তৈরি হয় নতুন প্রবাদ,—'*রাঁড়ী বেটীর বিয়ের শখ, উনায় রসের কত ঠমক*'।

১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে 'বিধবা বিবাহ' আইন পাশ হবার পর, ছ-মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর উদ্যোগ নিয়ে প্রথম বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করেন। পাত্র, সংস্কৃত কলেজের কৃতি

ছাত্র শ্রীশচন্দ্র। খাটুরা গ্রাম নিবাসী কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র ছিলেন শ্রীশচন্দ্র। পাত্রী, বর্ধমান জেলার অধিবাসী পটলডাঙা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা। বিবাহের দিন, ৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৬ (১২৬৩ সনের, ২৩শে অগ্রহায়ণ)। 'সংবাদ প্রভাকর' সূত্রে জানা যায় এই বিবাহের দিন স্থির হয়েছিল, ১৫ই অগ্রহায়ণ কিন্তু নানা বাধা বিপত্তিতে শ্রীশচন্দ্র বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং অনেক মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে ২৩শে অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন হিসাবে মনস্থির করেন। *'তত্ত্ববোধিনী'* পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, এই বিবাহের জন্য ৮০০ নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত হয়েছিল। পাত্রীর মাতা লক্ষ্মীমণি দেবীর নামে নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করা হয়। শ্রীশচন্দ্রের বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে কোনো সাহেবকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। কারণ দেশবাসীর ধারণা হতে পরে, এটা বিধবা বিবাহ নয়, 'সাহেব বিবাহ'। নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল বিধবা বিবাহের সমর্থনকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ ও সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তিকে। লক্ষ্মীমণিদেবী নিজ বিধবা কন্যার বিবাহ সম্প্রদান করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *'আত্মচরিত'*তে লিখেছেন,—*'' ১৮৫৬ সালের শেষ ভাগে [৭ই ডিসেম্বর] যেদিন প্রথম বিধবাবিবাহ হয়, সেদিন আমি বাসার লোকের সঙ্গে সে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম। সে কি ভিড়! [১২ নং] সুকিয়া ষ্ট্রীটের রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে ঐ বিবাহ হয়।''*[১৬]

এই বিবাহ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়েছিল। প্রচুর লোকসমাগম হলে একরকম পুলিশি নিরাপত্তার ঘোরাটোপে লুকোচুরি করে এই বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। পুরোহিতেরা বিবাহ মন্ত্র পাঠ করে শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ সম্পন্ন করেন। বিধবা পাত্রীর মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী কন্যা সম্প্রদান করেন। এদেশের বিবাহ রীতি অনুযায়ী, দানসামগ্রী, অলঙ্কার ও স্ত্রী আচার সবই পালিত হয়েছিল। স্ত্রী আচার, উলু ধ্বনি, বিবাহের রঙ্গরসিকতা—নাকমলা, কানমলা সবই হয়েছিল। এমনকি বিবাহে আগত অতিথিদের আহারের ধুম পড়ে যায়। বিহারীলাল সরকারের *'বিদ্যসাগর'* গ্রন্থসূত্রে আরো জানা যায়, প্রায় ছয়শত লোক এই বিধবাবিবাহে উপস্থিত হয়েছিল। ছয় শত কোল মন্ডা-মিঠাই খেয়ে, ঢোল তোলপাড় করে বিদায় গ্রহণ করে। এই বিবাহ অনুষ্ঠানকে ঘিরে, *'সংবাদ ভাস্কর'*, *'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'*, *'অরুণোদয়'* পত্রিকায় উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে, 'সংবাদ প্রভাকর', 'ইংলিশম্যান' প্রভৃতি পত্রিকায় রঙ্গতামাসা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়।[১৭]

এরপর, ৯ই ডিসেম্বর ১৮৫৬, কলকাতায় আরো একটি বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়।[১৮] পানিহাটি গ্রামের কুলীন কায়স্থ বংশের হরকালী ঘোষের ভ্রাতা কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র

মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে, কলকাতার নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্রের দ্বাদশবর্ষীয় বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। এখানে পিতা কন্যাকে সম্প্রদান করেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবা বিবাহ সংঘটিত হয় মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর দুই জ্যেঠতুতো ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও মদনমোহন বসুর সঙ্গে। এই বিয়ের ঘটক ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। এই বিবাহের কারণে রাজনারায়ণ বসুকে পারিবারিক ও সামাজিক নিগ্রহের স্বীকার হতে হয়। রাজনারায়ণ বসু তাঁর *'আত্মজীবনীতে'* লিখেছেন,—*'' তৃতীয় বিধবাবিবাহ ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ আমার জেঠতুতো ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন। এই বিধবাবিবাহ দেওয়াতে আমার খুড়ামহাশয় বোড়াল হইতে আমাকে লেখেন যে তোমার দ্বারা আমরা কায়স্থকুল হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। দুর্গানারায়ণ বসু যখন বিধবা বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন তখন গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুজ্জে তাঁহার পাল্কির ভিতর মুখ দিয়া বলিল, "দুর্গা তোর মনে এই ছিল, একেবারে মজালি।"*[১৯] ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিধবা বিবাহ নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। সম্পাদক হিসাবে *'তত্ত্ববোধিনী'* পত্রিকায় বিধবা বিবাহের সমর্থনকারী লেখাগুলিকে তিনি যত্ন করে ছেপেছিলেন। অন্যদিকে রক্ষণশীল মনোভাবে রাজনারায়ণ বসুকে পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেছেন,—*'' এই বিধবাবিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে, কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।"*[২০]

'বিধবা বিবাহ' আন্দোলনে ব্রাহ্ম ধর্ম্মান্দোলনের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের ভূমিকা অসামান্য। ১৮৫৬ সালে যে বছর বিধবাবিবাহ চালু হয় সে বছর প্রকাশিত হয় উমেশচন্দ্র মিত্রের *'বিধবাবিবাহ নাটক'*।উক্ত নাটকের অভিনয় হয় ১৮৫৯ সালে কলকাতার সিঁদুরিয়া পট্টির গোপাল মল্লিকের বাড়ি। এই নাটকের অভিনয়ে স্বয়ং কেশবচন্দ্র অভিনয় করেছিলেন। নাটক অভিনয়ের দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৬৪ সালে তাঁরই উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজে সংঘটিত হয় পৌত্তলিকা বর্জন করে প্রথম বিধবাবিবাহ । এছাড়া ১৮৮২ সালে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যেগে যে ১৩ টি বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল তার পাঁচটি ছিল 'বিধবাবিবাহ'। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের বন্ধু হাওড়া স্কুলের শিক্ষক ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ' আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। 'বিধবা বিবাহ' এর বিরোধিতা করে তিনি লেখেন *'বৈধব্য ব্রত'* নামক প্রবন্ধ। যেখানে বিধবাকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ না করার বিধান দিয়েছেন এবং সংযমী হবার পরামর্শ দিয়েছেন। *'ভূদেব চরিত'* গ্রন্থে ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,—*'' যখন মদ্যসেবী মাংসাহারী ইউরোপীয়*

দিগের কন্যাগণও ধর্মশিক্ষার প্রভাবে চিরকৌমার ব্রতের নিয়ম যথাযথ পালন করিতে পারিতেছে, তখন অত্যুদার সংস্কৃত শাস্ত্রের সাহায্যে আর্যবংশোদ্ভবা বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য পালন না হইবার কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।"[২১]

বিধবার বিবাহ দেবার জন্য, বিদ্যাসাগরকে সমকালে অনেক তাড়না, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। এমনকি, বিদ্যাসাগরকে প্রাণ নাশের হুমকি সহ্য করতে হয়। সেকালে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তাঁদের সকলকেই সামাজিক নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছিল। বিধবা বিবাহ সংস্পর্শ সেকালে সমাজচ্যুতির ভয় সৃষ্টি করেছিল। সমাজ তো বটেই, এমনকি সমর্থনকারী ব্যক্তির ঘর-পরিবার থেকে নানা নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। দুই ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও মদনমোহন বসুকে বিধবাবিবাহ দেবার জন্য, রাজনারায়ণ বসু গ্রামবাসী ও তাঁর পরিবারের কাছ হতে পেয়েছিলেন নিন্দা-নিগ্রহ। বোড়ালের বাসিন্দা রাজনারায়ণকে শুনতে হয়েছিল,—'*রাজনারায়ণ বসু গ্রামে আসিলে আমরা ইট মারিব।*' রাজনারায়ণ বসু তাঁর '*আত্মচরিত*' গ্রন্থে লিখেছেন,— ''*মাতাঠাকুরাণী, তিনি বলিলেন যে "রাজনারায়ণ তোর মনে এই ছিল''; এই বলিয়া অনেক অনুযোগ করিতে লাগিলেন...এই বিধবাবিবাহ সময়ে তিনি মথুরায় ছিলেন। তিনি সেই সময়ে বাটীতে থাকিলে আমার দুই ভাইয়ের বিধবাবিবাহ দিতে পারিতাম না।*"[২২]

ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী নিজেকে 'বিদ্যাসাগরের চেলা' বলে পরিচয় দিতেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের অন্যতম প্রচারক ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। ১৮৬৮ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী একটি বিধবা বিবাহের ঘটক রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই বিধবা বিবাহ প্রদানে সহায়তা করার জন্য পরিবার ও প্রিয়জনদের কাছ হতে তাঁকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়। ঈশানচন্দ্র নামে মেডিকেল কলেজের এক ছাত্রের বিধবা বোন মহালক্ষ্মীর সঙ্গে বিপত্নীক বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা বিবাহ দেওয়ার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীকে পরিবারের কাছ থেকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়। বিধবা বিবাহকারী পাত্র যোগেন্দ্রকে পরিবার থেকে বিতাড়িত হতে হয়; এমনকি, তাঁর বাড়িতে কাজের লোক হিসাবে চাকর-চাকরাণী পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন,—''*বিবাহের দিন স্থির করিয়া প্রায় দুই তিনজন ভদ্রলোককে মাত্র নিমন্ত্রণ করিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহের সমুদয় ব্যয় দিলেন, এবং আমার যতদূর স্মরণ হয়, কন্যাকে কিছু কিছু গহনা দিলেন। এই বিবাহের পরেই ভয়ানক নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। যোগেন্দ্রের আত্মীয়স্বজন তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন...তদুপরি চাকর চাকরাণী কেহই থাকে*

না, দিন চলা ভার।"[২৩]

এই ঘটনার কিছুদিন পর শিবনাথ শাস্ত্রী আরো একটি বিধবা বিবাহের সহায়ক রূপে অবতীর্ণ হন। কলকাতার স্বনামধন্য উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধবা বিবাহের উদ্‌যোগ করেন। উপেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের অভিনেতা, নাট্যকার, পরিচালক। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *'আত্মচরিত'*-এ লিখেছেন,—'' *হাইকোর্টের উকীল বাবু শ্রীনাথ দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস তখন কলিকাতার যুবক রিফর্মারদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি।...১৮৬৮ সালের মধ্য ভাগে উপেনের, প্রথমা স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু হইল। ...শোকটা পুরাতন না হইতে না হইতে এক দিন দুপুর বেলা উপেন কতিপয় বন্ধুসহ সংস্কৃত কলেজে আসিয়া আমাকে এল.এ ক্লাস হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, "তুমি শুনে সুখী হবে, আমি এক বিধবাকে বিবাহ করিতে যাচ্ছি। মেয়েটি ভবানীপুরে আছে, চুরি করে আন্‌তে হবে। তার মায়ের মত আছে; কিন্তু মামা অভিবাবক, তাঁদের মত নাই।*"[২৪] উপেন্দ্রনাথ দাসের পিতা উকিল শ্রীনাথ দাস ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু। উপেন্দ্রনাথ বিধবাবিবাহ করার জন্য শ্রীনাথ দাস তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। শেষদিন পর্যন্ত নিজ পুত্রের মুখদর্শন করতেও চাননি। এমনকি, উপেন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় পিতৃ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে স্বয়ং বিদ্যাসাগর গিয়ে শ্রীনাথ দাসকে অনুনয় বিনয় করলেও পিতা-পুত্রের মিলন ঘটাতে পারেননি।

বিদ্যাসাগর বিধবার পুনর্বিবাহে তিন প্রকার বিধবার কথা সামনে এনেছিলেন,—১) অক্ষতযোনি বিধবা, ২) ক্ষতযোনি বিধবা, ৩) পৌনার্ভব বিধবা। 'অক্ষতযোনি' অর্থে বোঝানো হয়েছে—যে নারীর বিয়ে হয়েছে কিন্তু নাবালিকা হওয়ার কারণে পিতৃগৃহে অবস্থান করেছেন ও বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে কখন মিলিত হননি এবং অকাল বৈধব্যের শিকার হয়েছেন। 'ক্ষতযোনি' বিধবা অর্থে নাবালিকা বালিকার বিবাহ হয়েছে ও স্বামীর ঘর করেছেন এবং সহবাস করেছেন। 'পৌনার্ভব' অর্থে পতির দ্বারা যিনি সন্তান জন্ম দিয়েছেন এবং বিধবা হয়েছেন। —এই তিন শ্রেণীর বিধবাবিবাহে'র উদ্‌যোগের কথা বলেছেন ঈশ্বরচন্দ্র।

'বিধবা বিবাহ' আইন চালু হবার প্রায় ১৪ বছর পর নিজের সন্তান নারায়ণচন্দ্রকে বিধবার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কৃষ্ণনগর, খানাকুলের অধিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর সঙ্গে বিদ্যাসাগর তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে বিবাহ দেন। তারিখ ২৭শে শ্রাবণ,১২৭৭। তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবাকে বিবাহ করুক এমনটা বিদ্যাসাগরের আত্মীয়-স্বজন চান নি। এমনকি, বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্রেরও ভাইপোর বিধবা

বিবাহে সংকোচ ছিল। এই সংকোচের অন্যতম কারণ ছিল 'অক্ষতযোনি'র বিধবা প্রসঙ্গ। বিদ্যাসাগর পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১৮৭০ সালে যে বিধবা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করেছিলেন, তিনি 'অক্ষতযোনি'র বিধবা নন।

নারায়ণচন্দ্র 'ক্ষতযোনি'র বিধবাকে বিবাহ করায় সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিধবা ভবসুন্দরী অক্ষতযোনি নয় বলে, বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র আপত্তি তুলে বিদ্যাসাগরকে অভিযোগ পত্র লেখেন। এর উত্তরে বিদ্যাসাগর লেখেন,—''*ইতিপূর্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে,...আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক; আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারীবিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম।...বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই।...কুটুম্বমহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম কেহ হইত না...আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।*''[২৫]

১৮৫৫ সালে বাংলায় সংগঠিত হয় 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', ১৮৫৬ সালে 'বিধবা বিবাহ' আইনে পরিণত হয় এবং ১৮৫৭ তে ভারতবর্ষে ঘটে 'সিপাহী বিদ্রোহ' এর ঘটনা। 'বিধবা বিবাহ' আইন প্রবর্তনের পূববর্তী ও পরবর্তী বছরে রাজনৈতিক ভাবে উত্তাল হয়ে ওঠে দেশ। ১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিদ্রোহ' বিদ্যসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন কিছুটা পরিমাণে স্তিমিত করে দেয়। দেশপ্রেমের নতুন জোয়ার ও ইংরেজ বিদ্বেষ সমাজে এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে হিন্দু বিধবার সংকট নিয়ে ভাববার মত সময় করে উঠতে পারেনি বাঙালি জাতি। বিদ্যাসাগরের একক চেষ্টায় সবচেয়ে বেশি বিধবা বিবাহ সংঘটিত হয়েছে। এর জন্য তিনি ঋণগ্রস্থ হয়েছেন, দেশের মানুষের কাছে ঠকেছেন। বাঙালি মেয়েদের ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি হিন্দু সমাজে খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি উনিশ শতকে। আর্থিক সুযোগ সুবিধা ও রমণীভোগের প্রলোভনে কেউ কেউ বিধবা বিবাহে অগ্রসর হয়েছিলেন সেকালে। 'বিধবাবিবাহে'র সুযোগ নিয়ে একদল অসাধু প্রবঞ্চক বহুবিবাহ করে অর্থ রোজগারের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এই অসাধু

উদ্যোগ রুখতে বিদ্যাসাগর এক টাকার স্ট্যাম্প পেপারে চুক্তি পত্র লিখিয়ে বিধবা বিবাহের উদ্‌যোগ করতেন। সেখানে সাক্ষী হিসাবে চারজন সম্ভ্রান্ত লোকের সই থাকত।

ডালহৌসির যুগে বিদ্যাসাগর তাঁর সমাজ আন্দোলন করেছিলেন। ডালহৌসির যুগকে বলা হয় 'ডেভলপমেন্টের' যুগ। রেলপথ, টেলিগ্রাফ, ডাকব্যবস্থার প্রচলন, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন— এ সবই ডালহৌসির যুগে সূচিত হয়েছিল। এই যুগ এক অর্থে গতির যুগ। এই নতুন যুগে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর আধুনিক মন নিয়ে বিধবা বিবাহ' আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন নির্ভীক, লোকনিন্দা বা সমাজচ্যুতির ভয়ে তিনি বিচলিত হন নি। তাঁর প্রচেষ্টায় 'বিধবা বিবাহ আইন' প্রণয়নের মধ্য দিয়ে সমাজ প্রগতির নতুন পথ তৈরি হয়। এই আন্দোলন ঘিরে সমাজে যে উদ্দীপনা তৈরি হয়েছিল তার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে। ১৮৫৫ সালে *'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'* প্রকাশিত হবার পর পক্ষে-বিপক্ষে প্রায় তিরিশটি প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির সাহিত্যিক মূল্য থাক বা না থাক, এর সামাজিক গুরুত্ব অস্বীকার করবার নয়। 'বিধবা বিবাহ' আইনত স্বীকৃতি পাওয়ার পর, সমাজের নানান স্তরে, বিশেষত শিক্ষিত মহলে, সাহিত্য চিন্তায় কবিতা, নাটকে, প্রবন্ধে গল্প-উপন্যাসে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে উঠে আসে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রসঙ্গ।

উৎস সূত্র ও টীকা:

১. *ক্ষিতিশ-বংশাবলি-চরিত,* অর্থাৎ নবদ্বীপ রাজবংশের বিবরণ, শ্রীকার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, কলিকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, সংবৎ ১৯৩২, [ইংরেজি ১৮৭৬] পৃ২০৩।

২. *জ্ঞানান্বেষণ,* ২১ শে অক্টোবর ১৮৩৭, জনৈক পাঠক, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (১৮৪০-১৯০৫), খন্ড-৪, বিনয় ঘোষ, পাঠভবন, জুলাই ১৯৬০,পৃ ৮০৩।

৩. *Bengal Spectator,* Vol. I, No 1, April 1842., বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, বিনয় ঘোষ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃ ২৪৪।

৪. *বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়কব্যবস্থা,* গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মা, ১৭৬৭ শকাব্দ [১৮৪৫]।

৫. *বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত,* সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত ও শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংশোধিত, কলিকাতা ইংরাজী-সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৮ সাল, পৃ ১১১- ১১৩।

৬.'' *কেহ কেহ বলেন, বীরসিংহ গ্রামে একবার একটি বালিকার বৈধব্য সংঘটনে ব্যথিত*

হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী শাস্ত্রমতে বিধবাবিবাহ হতে পরে কি, পুত্রকে এ প্রশ্ন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই হইতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করতে থাকেন।'','বিদ্যাসাগর , বিহারীলাল সরকার—৪র্থ সংস্করণ পৃ ৩২৭।

৭. *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, বিনয় ঘোষ*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃ ২৪৫।

৮. *'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'* (১ম খন্ড), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যসাগর, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

৯. *রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত*, রাজনারায়ণ বসু, কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা ১৩১৫, [ইংরেজি ১৯০৯]পৃ ৯৮-৯৯।

১০. *বিদ্যাসাগর*। সমালোচনা-সংবলিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী, বিহারীলাল, চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩২৯ সাল, কলিকাতা, পৃ২৮৪।

১১. *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ঐ, পৃ ২৬০।

১২. *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'* (২য় খন্ড),কলিকাতা, সংস্কৃত বিদ্যালয়, ৪ঠা কার্ত্তিক, সংবৎ ১৯১২ [১৮৫৬]। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, কলিকাতা, সংস্কৃত যন্ত্র, কলিকাতা লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত, ২৫ নং সুকিয়াস ষ্ট্রীট্, ২রা আশ্বিন ১৩০২, সম্পাদনায় নারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা, পৃ ২২০-২২২।

১৩. *বিধবা বিবাহ* (বিধবা আইন ও ধারা), নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,সারস্বতকুঞ্জ প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ, ১৩৩৫, ১৯২৮।

১৪. *বিধবা-বিবাহ-আইন*, ঈশ্বগুপ্ত, ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা, গ্রন্থাবলী সিরিজ, পৃ১২৩।

১৫. *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, শিবনাথ শাস্ত্রী, সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ, নিউ এজ পাবলিশার্স, , ২০০৯ সংস্করণ, পৃ ১৪০-১৪১।

১৬. *আত্মচরিত*, শিবনাথ শাস্ত্রী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, পৃ ৪৫।

১৭.'' *১৮৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার [বিদ্যাসাগরের] অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এক বিধবার পাণীগ্রহণ করিলেন। তাহাতে বঙ্গদেশে যে আন্দোলন উঠিল, তাহার অনুরূপ জাতীয় উত্তেজনা আমরা অল্পই দেখিয়াছি।'' 'রামতনু লাহিড়ী তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, শিবনাথ শাস্ত্রী, ঐ,পৃ ১৪০।

১৮. *বিদ্যাসাগর।* সমালোচনা-সংবলিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়,ঐ, পৃ ২৮৪।

২৯. *রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত*, রাজনারায়ণ বসু, কুন্তলীন প্রেস ১৯০৯, কলিকাতা ১৩১৫, পৃ ১০০।

২০. ঐ, পৃ ১০০।

২১. *ভূদেবচরিত* (প্রথম ভাগ) ,ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কুমারদেব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ইন্ডিয়া প্রেস, ১৩২৪ সাল।

২২. *রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত*, ঐ, পৃ ১০১।

২৩. *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, শিবনাথ শাস্ত্রী, ঐ পৃ ৯০।

২৪. *আত্মচরিত*, শিবনাথ শাস্ত্রী, ঐ, পৃ ৯৯।

২৫. *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ*, বিনয় ঘোষ, ঐ পৃ ২৩৯।

———